সাধারণ মধ্যবিত্ত সন্তুষ্ট থাকত ‘ক্যালিপসো’ বা ‘ফিয়েস্তা’ গ্রামোফোনে রেকর্ড বাজিয়েই। এগুলি ছিল ‘মোনো’। পরে এল স্টিরিওফোনিক সাউন্ডের রেকর্ড প্লেয়ার। বেশ জনপ্রিয় ছিল এইচএমভি টেন টেন ও টুয়েলভ টুয়েলভ এবং ফিলিপসের জিএফ ৫৩৩ মডেল। আর অসাধারণ ছিল সোনোডাউন মিউজিক সিস্টেম, তবে তা বেশ দামি। দেবব্রত, কণিকা, সুচিত্রা, নীলিমার কণ্ঠ ধরে রবীন্দ্রসঙ্গীত, মানবেন্দ্র, ফিরোজা বেগম, অঞ্জলি মুখোপাধ্যায়, ধীরেন বসুর কণ্ঠ ধরে নজরুলগীতি, নির্মলেন্দু চৌধুরীর সূত্রে পল্লীগীতি হৃদয় জুড়িয়েছে অসংখ্য সঙ্গীতপ্রেমীর। কম জনপ্রিয় ছিল না কীর্তন, নাটক ও যাত্রার রেকর্ড

কাগজের অফিসে চাকরি। ফলে রাত বারোটা সাড়ে বারোটার আগে কোনওদিনই বাড়ি ফেরা হয় না অরণ্যের। সেদিন আবার বিকেল থেকেই শ্রাবণের ধারাবর্ষণ। ঘোর মফস্সলের ছেলে অতিকষ্টে শহরতলিতে একটা এক কামরার ঘর জোগাড় করেছে। টাকার টানাটানি। তাই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রের সঙ্গে ওই ছোট্ট ঘরেই ভাগাভাগি করে থাকা। রাত ৯টা নাগাদ পাড়ার ওষুধের দোকান থেকে ফোন করে সুবীর নামে ওই ছেলেটি জানিয়েছে, হাঁটুজল তাদের বাসার সামনের রাস্তায়। অরণ্য পারলে যেন একটা টর্চ সঙ্গে নিয়ে আসে।

আশির দশকের গোড়ার দিক। মোবাইল, স্মার্টফোন তখন কল্পনার বস্তু। যোগাযোগের মাধ্যম বলতে রামুদার ওই ওষুধের দোকানের ল্যান্ডফোন। সুবীরের ফোন পেয়ে অরণ্য বুঝেছিল, আজ রাতে কপালে দুঃখ আছে। পুল কারে কাগজের অফিসের কর্মীদের বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা তখনও চালু হয়নি। অতিকষ্টে একটা শেয়ারের ট্যাক্সি ম্যানেজ করে রাত সাড়ে বারোটায় অরণ্য যখন তাদের বাসার গলির মুখটায় পৌঁছোল রাস্তায় একটা কুকুরও নেই। প্যান্ট হাঁটু অবধি গুটিয়ে সে নামল ট্যাক্সি থেকে। অতঃপর অসীম বিরক্তি নিয়ে জল ছপছপ করতে করতে বাসার দিকে এগোনো। এ তো জলস্রোত! অরণ্য জল ভেঙে এগোচ্ছে, তখনই ঘটল কাণ্ডটা!

গলির রাস্তায় ল্যাম্পপোস্টটায় মাসে অর্ধেক দিনই আলো জ্বলে না। মিত্তিরবাড়ির তিনতলার একটা ঘর থেকে টিউবলাইটের আলো বাঁকা হয়ে পড়েছে চঞ্চল জলস্রোতে। আলো-আঁধারিতে মনে হচ্ছে রূপোর বন্যা। আর তখনই কোথা থেকে অত্যন্ত মৃদু কিন্তু স্পষ্ট নারীকণ্ঠে ভেসে এল গান — ‘থই থই জলে ভেসে গেছে পথ, এসো এসো পথ ভোলা/সবার দুয়ার বন্ধ রয়েছে, আমার দুয়ার খোলা।’ মধ্যরাতে শহরতলির অন্ধকারে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে অরণ্যের মনে হচ্ছিল, জলের স্রোতে যেন ভেসে যাচ্ছে একটা গানের ভেলা। যে ভেলায় অঞ্জলি মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠ ধরে কখন যেন সওয়ারি হয়ে উঠে বসেছে সেও। তিন দশক পেরিয়ে এসেও অরণ্য ভুলতে পারে না জলের ঢেউয়ের মতো স্পন্দিত সেই কণ্ঠ।

না, প্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তনে গ্রামোফোন রেকর্ডের সেই ‘ম্যাজিক মোমেন্ট’টাই আজ পুরাবস্তু। রেডিওগ্রাম কী জিনিস, এ প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা জানেই না। ৭৮, ৪৫, ৩৩.১/৩ আর পি এম (রেভোলিউশনস পার মিনিট) স্পিড, এসপি, ইপি, এলপি — এই শব্দগুলোই অচল হয়ে গিয়েছে একালের ধ্বনির দুনিয়ায়। চোঙ লাগানো গ্রামাফোন বক্স অনেকদিনই অতীতের স্মৃতি, কিন্তু চোঙার সামনে বিশ্বস্ত কুকুরটির বসে থাকার ছবি (হিজ মাস্টারস ভয়েস) তো নিছক একটা রেকর্ড কোম্পানির প্রতীকচিহ্ন নয়, সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালির (বলা ভালো সব ভারতীয়রই) হৃদয়ের ধন। বিজ্ঞাপনে লেখা থাকত, ‘সুখী গৃহকোণ, শোভে গ্রামাফোন’। রেকর্ড কতটা মানুষের হৃদয় জুড়ে থাকত তার পরিচয় মিলবে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘কিন্নর দল’ ও মনোজ বসুর ‘বাঘ’ গল্পে। এইচএমভি একা নয়, হিন্দুস্থান (পরে ইনরেকো), কলম্বিয়া, সোনোলা, ওডিঅন, সিবিএস, মেগাফোন, ভারতী — এমন বিভিন্ন দেশি ও বিদেশি রেকর্ড কোম্পানি বছরের পর বছর গানের ডালা সাজিয়ে রাখত সাধারণ মানুষের জন্য। কত অখ্যাত কণ্ঠ কালো ওই ঘুরন্ত চাকতির দৌলতে চিরদিনের মতো ঠাঁই নিয়েছে হাজার হাজার শ্রোতার হৃদয়ে। পুজোর সময় অধীর অপেক্ষা থাকত হেমন্ত, সন্ধ্যা, প্রতিমা, মান্না, আরতি, ধনঞ্জয়, দ্বিজেনের নতুন কী গান বেরোল তা নিয়ে। ‘এইচএমভি’ পুজোর আগে বার করত ‘শারদ অর্ঘ্য’ বই। সে নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যেত ঘরে ঘরে।

অরণ্যের মতো অনেকেরই প্রিয় সাধ ছিল কবে নিজের একটা রেকর্ড বাজানোর যন্ত্র হবে। রেডিওগ্রাম ছিল অতি অভিজাতদের ড্রয়িং রুমের প্রদর্শ্য সামগ্রী। স্টাইলাস সরে যেত, আর নিজে থেকেই টার্ন টেবিলে একের পর এক রেকর্ড বসে যেত ঘুরন্ত চাকতিটির উপর। ঘর গম গম করে উঠত, সন্ধ্যার ‘মায়াবতী মেঘে এল তন্দ্রা’, লতার ‘সাত ভাই চম্পা’, হেমন্তের ‘মেঘ কালো আঁধার কালো’ গানে। তবে সাধারণ মধ্যবিত্ত সন্তুষ্ট থাকত ‘ক্যালিপসো’ বা ‘ফিয়েস্তা’ গ্রামোফোনে রেকর্ড বাজিয়েই। এগুলি ছিল ‘মোনো’। পরে এল স্টিরিওফোনিক সাউন্ডের রেকর্ড প্লেয়ার। বেশ জনপ্রিয় ছিল এইচএমভি টেন টেন ও টুয়েলভ টুয়েলভ এবং ফিলিপসের জিএফ ৫৩৩ মডেল। আর অসাধারণ ছিল সোনোডাউন মিউজিক সিস্টেম, তবে তা বেশ দামি। দেবব্রত, কণিকা, সুচিত্রা, নীলিমার কণ্ঠ ধরে রবীন্দ্রসঙ্গীত, মানবেন্দ্র, ফিরোজা বেগম, অঞ্জলি মুখোপাধ্যায়, ধীরেন বসুর কণ্ঠ ধরে নজরুলগীতি, নির্মলেন্দু চৌধুরীর সূত্রে পল্লীগীতি হৃদয় জুড়িয়েছে অসংখ্য সঙ্গীতপ্রেমীর। কম জনপ্রিয় ছিল না কীর্তন, নাটক ও যাত্রার রেকর্ড। ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের কীর্তন, সিরাজদৌল্লা নাটক, নটী বিনোদিনী যাত্রাপালা ও দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের লেখা অবলম্বনে লং প্লেয়িং রেকর্ডে ‘ঠাকুরমার ঝুলি’ একসময় ঘরে ঘরে বেজেছে।

বাজারে ক্যাসেট ও টেপ রেকর্ডারের আমদানির সময় থেকেই পড়তে থাকে রেকর্ডের বিক্রি। তারপর চলে সিডির যুগ। এখন মোবাইলে বন্দি ইউটিউবের মতো সাইট খুললেই শয়ে শয়ে গান। ফলে রেকর্ড ক্যাসেট বাজার থেকেই বিদায় নিয়েছে। ওয়েলিংটন স্কোয়ারে রেকর্ড ক্যাসেটের ফুটপাথের স্টলগুলির সংখ্যা হাতে গোনা। যে দু’একটি আছে তাদেরও করুণ অবস্থা। হালের চিত্রটা কেমন, দেখতে এই প্রতিবেদক একদিন হাজির ওয়েলিংটন পাড়ায়। অতঃপর সেই অভিজ্ঞতারই বিবরণ।

... ...

তখন বিকেল পাঁচটার মতো হবে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর মিলল দোকানটা। দোকানের সামনে একটা টুলে বসে রয়েছেন এক বৃদ্ধ। দু’একটা কথা বলতেই বুঝে গেলেন আমিও আর পাঁচজনের মতো। মানে, আর যাই হোক ক্রেতা নই। এসেছি কিছু খবর নিতে। যেমনটা আসেন আর পাঁচজন। কেবলই দরকারে। ভাবলেশহীন চোখে তাকিয়ে রইলেন বেশ কিছুক্ষণ। তারপর নিপাট সাধারণ এক প্রশ্ন, বলুন কী জানতে চান? আসলে, বছর ১০-১৫ ধরে এটাই তো রোজনামচা হয়ে গিয়েছে রশিদ চাচার।

কলকাতার ধর্মতলার মোড় থেকে মিনিট কুড়ি হাঁটলেই রশিদ চাচার দোকান। দোকান না বলে গুমটি বলাই ভালো। টিম টিম করে একটা আলো জ্বলছে। গরম থেকে বাঁচার জন্য ভরসা ভাঙাচোরা হাতপাখাটা। খদ্দের বছরে একটাও আসে কিনা সন্দেহ। কেনাবেচা তো কবেই উঠে গিয়েছে। বছর কয়েক আগে তাও দু’একটা রেকর্ড কেনাবেচা হত। এখন সে পাঠ চুকেছে। কেবল বাপ-ঠাকুরদার ব্যবসা, তাই আবেগের বশে দোকানটা বিক্রি করতে পারেননি। সে সময় আশপাশে আরও অনেক রেকর্ডের দোকান ছিল। সবই আস্তে আস্তে উঠে গিয়েছে। কথাগুলো বলার সময় কেমন যেন আবেগে ভেসে যাচ্ছিলেন চাচা। তাঁর অবর্তমানে এই দোকান বিক্রি হয়ে যাবে, সে কথা ভালোই জানেন। নিজের দুই ছেলে। দু’জনেরই ব্যবসা। ‘যৌথ পরিবার। মোটের উপর চলে যায়, তাই সময় কাটাতে এখানে আসি। দোকানটা খুলি। অনেক পুরোনো স্মৃতি মনে পড়ে যায়।’ একমনে বলে চললেন চাচা।

আসলে সময় এত এগিয়েছে, রেকর্ড-ক্যাসেট-সিডির বাজার শেষ হয়ে গিয়েছে। ব্যবসা লাভজনক নয়, এই অজুহাতে কলকাতা থেকে হাত তুলে নিয়েছে, ‘মিউজিক ওয়ার্ল্ড’। দেশব্যাপী ব্যবসা ছিল। কিন্তু আয় কমেছে প্রতিদিনই। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে খরচের বহর। তাই ব্যবসা গুটিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত। ১৯৯৭ তে চেন্নাইয়ে শুরু। ২০১৩- তে কলকাতায় শেষ। তখন কর্তৃপক্ষের সাফাই ছিল, ক্যাসেট-সিডি-ডিভিডি-র বাজার আর নেই। পাল্টে গিয়েছে সব কিছু। এখন আর লম্বা হাঁ করা চোঙার দিকে তাকিয়ে তুলতুলে কুকুরটা লাট্টু পাক খায় না। অবিরাম ঘুরতে দেখা যায় না গোল কালো চাকতিটাকে। যা থেকে বেরিয়ে আসে না পরিচিত-অপরিচিত সুরের ঢেউ। আজ যা হারিয়ে গিয়েছে।

দিন বদলেছে। জগতের নিয়মেই। কুকুর আছে। কেবল মোবাইল সংস্থার বিজ্ঞাপনে। যাকে দেখলে আজ ড্রইং রুম দ্রুত সরগরম হয়। কালো গোল চাকতি নেই। যার জায়গা নিয়েছে আধুনিক প্রযুক্তি। পুরোনো দিনের গাড়ি স্টার্ট করার মতো হ্যান্ডেল ঘোরানোর পদ্ধতিও বিদায় নিয়েছে। সহজ বোতাম টিপে চালানো যাচ্ছে গাড়ি। বদলেছে অনেক কিছু। কিন্তু নড়ানো যায়নি ঐতিহ্যের মিনার। আঁচড় বসানো যায়নি ইতিহাসের দলিলে। রাইচাঁদ বড়াল বা কে এল সায়গল-রা এখনও উজ্জ্বল, পুরোনো যন্ত্রে ধরা রাখা সাত সুরের সাহায্যে। সায়গলদের ইতিহাস লিখতে বসলে অবশ্যই আসবে রেকর্ডের কথা। পোশাকি নাম ডিস্ক। আসবে হিজ মাস্টার্স ভয়েস-এর প্রসঙ্গ। লোকের মুখে মুখে যার পরিচয় ছিল এইচএমভি। আজও ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে রয়েছে দমদম। যেখানে ছিল সংস্থার কারখানা। একদিকে বিমান ওড়ার কর্কশ আওয়াজ। উল্টোদিকে বন্ধ ঘরে বসে সুরেলা কণ্ঠ সংরক্ষণের প্রচেষ্টা।

পুজোর গান একসময় ছিল শারদোৎসবের অন্যতম অঙ্গ। শ্রোতাদের তুমুল আগ্রহ, পুজোয় কোন কোন শিল্পী কী কী গান করছেন। কাগজে ঢালাও বিজ্ঞাপন।

রাইচাঁদ বড়াল বা কে এল সায়গল-রা এখনও উজ্জ্বল, পুরোনো যন্ত্রে ধরা রাখা সাত সুরের সাহায্যে। সায়গলদের ইতিহাস লিখতে বসলে অবশ্যই আসবে রেকর্ডের কথা। পোশাকি নাম ডিস্ক। আসবে হিজ মাস্টার্স ভয়েস-এর প্রসঙ্গ। লোকের মুখে মুখে যার পরিচয় ছিল এইচএমভি